কথা হয়ে গেছে। আমি বাঁধা পড়ে গেছি। এখান থেকে ফিরেই বসতে হবে বিয়ের পিঁড়িতে। ছেলে দুবাইতে সেলসম্যান।

কাঞ্চন এগিয়ে এসে ধরলো ওর হাত দু'টো। বললো—তুমি আমার জীবনের প্রথম ভালবাসা। তোমাকে হারাতে চাই না। আমাকে দেখে তোমার যদি ভরসা হয় চলে এসো, আমার আপন ভুবনে। সেখানে তোমাকে, তোমার স্বাধীনতায় কেউ বাধ সাধবে না। শুধু থাকবে ভালবাসা, সীমাহীন, সাগরের মতো।

কাঁদছে মিরা। টপ টপ করে গড়িয়ে পড়ছে ওর চোখের জল মুক্তার দানার মতো। বললো—কেন এলে না আরো খানিকটা আগে! কেন সাহস দিয়ে কাছে টেনে নিলে না!

কাঞ্চন ধরা গলায় বললো—হয়তো নিয়তি। তবে তাকে বদলানোর জন্য আমরা রুখে দাঁড়াতে পারি, এখনো সময় আছে।

নিয়তি কখনো বদলে না, বদলান যায় না। মিরার গলা কান্নায় বুজে এলো। বললো—হয়তো আমরা খেলাচ্ছলে দেরি করে ফেলেছি।

আমি তোমার আব্বার সাথে দেখা করবো। দৃঢ় কণ্ঠ কাঞ্চনের।

না, না! ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠলো মিরা। ওরা আমাকে মারবে, মেরে ফেলবে। আমার ভাইরা সবাই সৎ ভাই। আর বাবা! আমার দুর্ভাগ্য, তিনি মা'র কথায় ওঠেন বসেন।

কাঞ্চন মিরার হাত দু'টো ধরে বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর ধরা গলায় বললো—চলো, এগিয়ে দিয়ে আসি।

না, আমার সে সাহসও নেই। তোমাকে আমার সাথে নেয়া যাবে না। আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিল মিরা।

ঘুরে দাঁড়িয়েছে মিরা। চলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। যতক্ষণ দেখা যায় মিরাকে, তাকিয়ে থাকলো কাঞ্চন।

এক সময় নাই হয়ে গেল মিরা!

মিরা নেই, মিরা হারিয়ে গেছে! যেন দেখা দিয়েছিলো মেঘের ফাঁকে উঁকি দেয়া একরাশ জ্যোৎস্না! আবার তাকে আড়াল করেছে চাপচাপ মেঘ! হঠাৎই মনে হলো ক্রিসেন্ট লেকের সব সোডিয়াম লাইট আর্তনাদ করে ছোটাছুটি করেছে। ওরা যেন জীবন্ত সব। রাতের হালকা অন্ধকারে বৃক্ষেরা মাথা ঝাঁকিয়ে চিৎকার করছে! দলছুট হালকা কুয়াশার দল চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

সোডিয়াম লাইটগুলো এঁকেবেঁকে ছুটতে ছুটতে চিৎকার করে বলছে—মিরা, তুমি ফিরে এসো। বৃক্ষরাজি একযোগে আর্তনাদ করে উঠলো, ফিরে এসো মিরা! কোত্থেকে উদয় হলো এক ঝাঁক রাতজাগা পাখি। ওরা ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে কাতর কণ্ঠে ডাকলো—মিরা, তুমি ফিরে এসো! এবং হঠাৎ লাল শাপলাগুলো জলের বাঁধন ভেঙে বেরিয়ে এসে একযোগে চিৎকার করে বললো—মি.....রা, মি-মি.....রা.....রা.....তুমি ফিরে এসো!

গাধা

চাচা, লাঙ্গল চলে না। এবার গরুগুলা ঠিকমতো খায় নাই। সোলায়মান তাকালো ছোট মোল্লার দিকে। সে জানে মোল্লাই ওর গুরুজন। বড় মোল্লা অন্ধ, বেশ কয়েক বছর ধরে। সব কাজ ছোট মোল্লা সামলায়। বিএ পাশ করার পরে সংসারের হাল ধরেছে সে, বড় মোল্লা, অন্ধ হবার পর পরই। তা না হলে সব উচ্ছন্নে যেতো এতো দিনে।

গুরুজনের নাম মুখে নিতে নেই, সোলায়মানের বাপজান ওকে শিখিয়েছেন। ছোট মোল্লার পুরো নাম রউফ উদ্দিন মোল্লা। সংক্ষেপে রউফ বলে কেউ ডাকলে সে কানে আঙুল দেয়। যার বাড়িতে বাপ-দাদার আমল থেকে কাজ করে খায় তাদের নাম মুখে আনাও পাপ, সোলায়মান মনে মনে ভাবে।

ছোট মোল্লা হাসলো। বললো—সলু, তুই একটা গাধা।

সোলায়মান হাসলো হে হে করে। বললো—চাচাজান, তা যা কইছেন মন্দ না। অইতেও পারি গাধা। আপনি মন্দ কইলে মিঠা মিঠা লাগে।

ছোট মোল্লা বললো—তুই বাপ জানকেও চাচা ডাকিস, আমাকেও চাচা ডাকিস, কথাটা কী মেলে?

ছোট মোল্লার প্রশ্নের জবাবে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকায় সোলায়মান। মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললো—বড়জন অর্থাৎ আপনার বাপরে ডাকি চাচা—ঠিক। আপনারেও ডাকি ছোট চাচা—সম্মান দিতে অইব না? আপনি আমার মালিক না?

দাঁত কিড়মিড় করলো রউফ মোল্লা। বললো—তুই আমারে ভাইজান ডাক, গাধা। তাতেই সম্মান হবে।

না ছোট চাচা— হেইডা পারতাম না। কেমন যেন আপন আপন লাগে ভাইজান ডাকলে, তখন আর মালিক মালিক লাগে না।

আমাকে মালিক মালিক লাগা কি খুব জরুরি? রউফ তাকালো সোলায়মানের মুখের দিকে।

সোলায়মান মুখে চুক চুক করে শব্দ করলো। তারপর বললো—তওবা, তওবা। মালিকরে মালিক মালিক না লাগলে চলবে ক্যামনে? সোলায়মানের চোখে বড় একটা প্রশ্ন ঝুলে রইলো।

ছোট মোল্লা বিরক্ত হয়ে বললো—তোর যা খুশি ডাক আমাকে। এখন বল কী বলছিলি?

চব্বিশ বছরের জোয়ান ছেলে সোলায়মান, তাগড়া শরীর। গত আঠার বছর ধরে মোল্লা বাড়িতে আছে। রউফের চেয়ে বছর পাঁচেকের ছোট। এ পরিবারের একটা অংশ হয়ে গেছে সে। যে কোন কাজ অসুরের শক্তিতে করে চলে। কিন্তু ওকে চালাতে না পারলে সব গোলমাল পাকিয়ে একাকার করে ফেলে। এই তো গত পরশু ওকে রউফ বললো, পশ্চিমের বাগানের সুপারি পেড়ে আন। ঘণ্টা তিনেক পরে বাগানে হাজির হয়ে গালে হাত দিয়ে বসলো রউফ। বললো—ওরে সলু, তুই করেছিস কী?

জবাবে সোলায়মান একগাল হেসে কোমর থেকে গামছাটা খুলে মুখ মুছতে মুছতে বললো—সব সুপারি গাছ দিয়া নামাইলাম, তাই কইলেন মনে অইলো।

ছোট মোল্লা মাথার চুল চুল টানতে টানতে বললো—আরো গাধা, তাই বলে তোকে কাঁচা সুপারি তো নামাতে বলিনি, এটা কী করলি?

চাচা এডা কি ভুল কাম করলাম? আবার জিজ্ঞেস করলো—সোলায়মান। ওর চোখ দু'টো সামান্য বড় হলো, অবাক হলে ওর চোখ সে কথা বলে দেয়।

ছোট মোল্লা এবার রাগে গরগর করতে করতে বললো—বহুত পুণ্যের কাজ করছ। তোর মাথায় আসলে গোবর ঠাসা। আরে হাঁদারাম—কাঁচা সুপারি বেচবি কেমন করে? দাম পাবি না তো।

চাচা মাথায় কইরা হাটে নিয়া যামু, নৌকা ভাড়া বাচাইয়া দিমু, আপনি ভাববেন না।

এবার ছোট মোল্লার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। বললো—চুপ গাধা। তোরে মানুষ করা আমার সাধ্যে নাই। এরপর যা বলবো সব বুঝে তারপর কাজে হাত দিবি, বুঝলি?

সোলায়মান নিজের মাথায় দুই চড় লাগালো। বললো—কন দেহি চাচা, মাথাডা কাম করে না ক্যান? আপনি যা কন কান দিয়া শুনি, মনে মনে বোঝার চেষ্টা করি, পরে জানি কেমন একটা প্যাচ লাইগ্যা যায়।

ঠিক আছে, এরপর সব জিজ্ঞেস করবি, মনে সন্দেহ হলে বারবার জিজ্ঞেস করবি। রউফ ওকে আর বকাঝকা না করে উপদেশ দিলো।

আইচ্ছা। মাথা নেড়ে সায় দিলো সোলায়মান।

আজ আবার খানিকটা থেমে ছোট মোল্লার প্রশ্নের জবাবে বললো—কি আর কমু? ঐ যে হেদিন কইছিলেন, কিছু না বুঝলে বারবার জিগাইতাম—আজ জমিতে লাঙ্গল দিলাম, ঠিকমতো লাঙ্গল চলতেছিলো না।

জমিতে পানি উঠেছে? ছোট মোল্লা ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

না না, অহন পর্যন্ত উডে নাই। বলে এপাশ ওপাশ মাথা নাড়তে নাড়তে লাগলো সোলায়মান।

শুকনো মাটিতে চাষ দিছ? বিরক্ত হয়ে সোলায়মানের দিকে তাকালো ছোট মোল্লা।

হ, তাই করছি। ভাল চাষ অয় নাই। গরুগুলো দেখতে তাজা কিন্তু কামের সময় ঠিক ঠনর ঠন। বলে বুড়ো আঙুল দেখালো সোলায়মান।

ছোট মোল্লা এবার চটলো। বললো—আরে আন্দামানের গাধা, তোকে আল্লা কেন বানিয়েছে? তুইতো গরুগুলো মেরে ফেলবি। বলেছি একটা বর্ষার পরে বা জোয়ারে পানি উঠলে চাষ দিবি। তখন মাটি নরম থাকবে।

মাথা চুলকাতে শুরু করলো সোলায়মান। বললো—তাই কইছেলেন বুঝি? আমি ভাবলাম এহনই দিতে অইবো।

ছোট মোল্লা গম্ভীর হলো। বললো—দ্যাখ সলু, দেশে এখন গোলমাল, পাকিস্তানি আর্মি আর রাজাকারের ভয়তে অস্থির থাকি। এদিকেও নাকি এসে যাবে শিগ্রই, তুই আর ঝামেলা বাড়াস না।

সোলায়মান বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো। বললো—চাচা, আমার বুদ্ধি কম, তয় হাত দু'হানে আল্লায় শক্তি দিছে। তেনারা আইলে বোঝন যাইব কত ধানে কত চাইল।

ছোট মোল্লা ওর দিকে তাকালো। মনে মনে ভাবলো ভরসা করা যায়। তবে বন্দুকের সামনে মানুষ তো আর কুতুব মিনার না। বললো—ওদের সাথে বন্দুক রাইফেল থাকবে, কিছু করার উপায় নাই, যা বলবে শুনতে হবে। শোন নাই, বানাইর হাট গত সপ্তাহে জ্বালিয়ে দিলো পাকিস্তানিরা? সাথে আছে সাহায্যকারী আমাদের ফতুয়া পার্টি।

চাচা, ফতুয়া পার্টি কী? নতুন কোন বাহিনী। সপ্রশ্ন সোলায়মান তাকালো ছোট মোল্লার দিকে।

তুই সত্যিই গাধা। ফতুয়া পার্টি বুঝলি না? আমাদের দেশি গাদ্দার, বেঈমানের দল। বলতে বলতে হাসলো রউফ।

সোলায়মানের অবাক চোখের দিকে চেয়ে বললো—সোজা কথায় না বললে বুঝিস না, তাই না? ওরে গাধা, সাথে ওরা রাজাকার। দেশি লোকে পথ না দেখালে পাকিস্তানিরা চিনবে কী করে, কোনটা বানাই আর কোনটা বানুরিপাড়া।

হাসছে সোলায়মান। রউফ মোল্লা অবাক হয়ে বললো—হাসছিস যে?

হাসব না ক্যান, কথাডা কইছেন সুন্দর, কবিয়ালগো লাহান। সোলায়মান দাঁত বের করে হে হে করে হাসলো।

রউফের মুখেও হাসি ফুটলো। কিন্তু সোলায়মানের বোকামির জন্য বিরক্তিভাব জেগে রইলো সারাক্ষণ। দুপুরে বাবার কাছে সোলায়মানের নির্বুদ্ধিতার জন্য অভিযোগ করলো। বললো—বাজান, সলু একদম গাধা। উল্টাপাল্টা কাজ করে সব শেষ কের ফেলবে। কি করি বলো দেখি! ছাড়িয়ে দেবো?

বড় মোল্লা বেশির ভাগ সময়ই আল্লাহ আল্লাহ করে সময় কাটায়। নিজের চৌকি সাধারণত ছাড়ে না। বেশি প্রয়োজন হলে লাঠি হাতে ঠিক ঠিকই চলাফেরা করতে পারে, কম কথা বলে তবে যা বলে রউফ তা অক্ষরে অক্ষরে মানে। সে জানে তার বাবার হিসাবে ভুল হয় খুবই কম। জীবনে ছেড়া জামা গায় দিয়ে তার বাবা বিত্তের সন্ধানে বের হয়ে বিত্তবান হয়েছে প্রৌঢ়ত্বে। হঠাৎ দুর্ঘটনায় চোখ হারাবার পর ছেলে রউফকে দেখাশুনা করতে হচ্ছে সব সম্পত্তি। তবে যে কোন ব্যাপারে সে বাবার পরামর্শ মেনে নেয় অক্ষরে অক্ষরে।

না। বড় মোল্লার সাফ জবাব তার হাতের তজবির দানা অবলীলায় গড়িয়ে চলছে।

রউফ অবাক। বাবা তুমি ভুল করছ না তো?

বড় মোল্লা বসে বসে ডানে বায়ে মাথা নাড়লো। রউফ, আমার চোখ নাই, কান এখন চোখেরও কাম করে। ও সব শেষ করবে না।

ও এক্কেবারে গাধা, মাথায় ঘিলু নাই। রউফের গলায় একরাশ বিরক্তি।

ওর ঘিলুর দরকার নাই। ওর বাবারও ঘিলু ছিলো না কিন্তু মনটা ভাল ছিলো। ওকে কোনদিন তাড়াবি না। বলে চুপচাপ তজবি নাড়তে লাগলো বড় মোল্লা।

এর মধ্যে সোলায়মান বড় মোল্লার জন্য হুক্কা নিয়ে ঢুকলো। হাঁটতে হাঁটতে কলকির তামাকে আগুনে গাল ফুলিয়ে ফু দিতে লাগলো। এসে দাঁড়ালো বড় মোল্লার সামনে। নলটা এগিয়ে দিতে দিতে বললো—ধরেন, তামাক সাজাইয়া দিছি।

ঠিক আছে, তুই যা আমি এহন কথা কইতাছি। বড় মোল্লা নলটা ধরতে ধরতে বললো।

ছোট চাচার মুখটা ভার ভার ক্যান? কোন অসুবিধা না তো! অইলে কইয়েন। আমি আছি না? বলে সোলায়মান দাঁড়িয়ে রইলো।

বাবা, তুই গোসল সার, কথার মধ্যে কথা কইস না। বড় মোল্লা সোলায়মানকে উদ্দেশ্য করে বললো।

হয় চাচা, কথার মধ্যে কথা কওন ভাল না। চলে গেলো সোলায়মান।

রউফ, ওরা চারপুরুষ আমাদের ঘরে। ওর দাদা ডাকাতের হাত থেকে তোর দাদাজানকে জান দিয়া বাঁচাইলো। কিন্তু নিজে বাঁচলো না। ওরা খুব অনুগত, বুদ্ধি কম কিন্তু দিলটার মধ্যে অনেক ভালবাসা মনিবের জন্য। এ রকম আর পাবি না। বড় মোল্লা ছেলেকে উপদেশ দেন।

ঠিক আছে বাবা, তুমি যা বলো। আমতা আমতা করতে লাগলো রউফ।

সোলায়মান থাকবে, অবশ্যই থাকবে। জোর দিয়ে বললো বড় মোল্লা। বললো—আমি চোখে দেখি না, শুনি লড়াই শুরু অইছে। তোমার এখন সতর্ক থাকতে অইবে। এদিক বাদ দিয়া ঐদিক চিন্তা কর।

বাজান, সতর্ক হয়ে লাভ কী, যাবো কোথায়? রউফের কণ্ঠে স্পষ্ট হতাশা।

নিজের গ্রাম ছাড়তে কই নাই, তবে দরকারে যাতে নিজদের বাঁচাইতে পার সে ব্যবস্থা করবা না? বলতে বলতে বড় মোল্লা সামান্য হাসলো।

রউফ মোল্লা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লো। বললো—বাজান, তুমি ঠিক বলছো। রাজাকাররা ব্যক্তিগত শত্রুতা চরিতার্থ করতে আর্মি নিয়ে ঢোকে, ঘরবাড়ি জ্বালায়, মেয়ে ছেলে ধরে নিয়ে যায়। আল্লাহ সইবে না, দেখবা।

কিছুক্ষণ হাতের তজবিটা নাড়াচাড়া করলো বড় মোল্লা। তারপর আস্তে আস্তে বললো—

বৌমা আর মহুয়ারে তোমার খালার বাড়ি পাঠাও, ওদিকে এখনও বিপদ যায় নাই। আর হোন, গত সপ্তাহে না মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার তার লোকজন লইয়া আইলো, তাদের খাওয়াইয়া জামাকাপড় আর টাকা দিলা? বড় মোল্লা, হুক্কার নল গুড় গুড় করে টানতে টানতে বললো।

হু। আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো রউফ।

বড় মোল্লা গড়গড়া টানতে টানতে ধোঁয়া ছাড়লো এক গাল। কাশলো খুক খুক করে। বললো—বেড়ারও কান আছে, খবর বাতাসে ঘোরে। সাবধানে না থাকলে রাজাকার বা পাকিস্তানিদের হাতেই বিপদে পড়বা।

এরই মধ্যে গামছায় শরীর মুছতে মুছতে সোলায়মান ঢুকলো, ভিজা চুলে। নিজে থেকেই বললো—বড় চাচা, হুনলাম এদিকেও নাকি আর্মি আইব। কনতো আমিও যুদ্ধে যাই।

তুই হাদা, যুদ্ধে যাবি কী? কিছু জানিস নাকি? তিরস্কার করলো রউফ।

পথে ঘাটে যা শুনি, পাকিস্তানিরা যা করতে লাগছে, আমার কিন্তু চাচা রক্ত টগবগ কইরা ফুটতেছে। না জানি, মুক্তি ভাইগো লগে থাইক্যা শিখ্যা নিমু।

থামা তোর লেকচার, যাইয়া ভাত খা। বিকালে কাজে যাবি বড় ভিটায়। রউফের কণ্ঠে স্পষ্ট বিরক্তি।

বড় মোল্লা গলা খাকারি দিলো। তারপর সোলায়মানকে বললো—সলু, দেখ বাবা, চোখে দেখি না। তুই আমার লাঠি। আমার আশপাশে থাকাটাই তো তোর যুদ্ধ। আমি অন্ধ মানুষ।

সোলায়মান খুশি হয়ে হাসলো। ওর খুশির হাসি একটু উচ্চগ্রামের হয়। মনে হয় ঘরের বেড়া কাঁপছে। হাসতে হাসতে বুকে টোকা দিয়ে বললো—চাচা, ভাববেন না, সলু থাকতে আপনার গায় ফুলের টোকাটাও লাগবে না।

বড় মোল্লা কোন জবাব দিলো না। গুড় গুড় করে হুক্কার নলে ছোট ছোট টান দিতে লাগলো।

২

সত্যি সত্যিই ছোট মোল্লা চিন্তিত। সোজা আলোর দিকে তাকিয়ে আছে বহুক্ষণ। আজ বাসায় সোলায়মান নেই। বাবার পরামর্শ মতো স্ত্রী আর ছোট বোন মহুয়াকে খালার বাড়ি বেড়াতে পাঠিয়েছে। মহুয়ার বিয়ের কথাবার্তাও হচ্ছে। ছেলেটা মনে হয় ভালই হবে, বিএ পাশ করে গ্রামের স্কুলে মাস্টারি করে। সাথে সাথে নিজের বাবার সহায় সম্পত্তি দেখাশুনা করছে সে। ভদ্র বংশের। যে দিনকাল পড়েছে, কখন যে রাজাকার কিংবা পাকিস্তানিদের নজরে পড়বে! এ ছাড়া মাঝে মধ্যে ডাকাতের উৎপাতও বেড়েছে। ভাবতে ভাবতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো রউফ।

রাজাকার কমান্ডার পাশের গ্রামের সৈয়দ আলী। লেখাপড়া টিপসই কিন্তু এখন তার মুখে কথার খই ফোটে। গত পরশু সে এসেছিলো। সম্প্রতি চাঁদাবাজিও শুরু করেছে।

বললো—মোল্লা সাব, হাজার পাঁচেক টাকা লাগবে, দরকার আছে।

হঠাৎ তোমাকে টাকা দেব, তা কী দরকারে নিবা? এতো টাকা একবারে দেবই বা কী করে? রউফ সব বুঝেও না বোঝার ভান করে।

সৈয়দ আলী সবজান্তার মতো হাসি দিয়ে মেচ কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে বললো—মোল্লা সাব, সব খবরই কানে আয়। অন্য লোকজনেরে তো দেওনের সময় আপনার আবার হাত খুইল্যা যায়। ভাল ভাল, সময় থাকতে আমাদের জন্য দরদি হাতটা খোলেন। আজকাল যে ভাবে লোকজনের লাশ পড়তে লাগছে, বুদ্ধি থাকলে দিলে একটু ডরভয়ও থাকনের কথা আপনার।

তুমি কী আমাকে ভয় দেখাও? ছোট মোল্লা গম্ভীর হয়।

রাইফেলটা মাটিতে রেখে তার ওপর ভর দিয়ে কমান্ডার একটু ঝুঁকে দাঁড়ালো। কিছুটা ধমকের সুরে ফ্যাসফেসে গলায় বললো—মোল্লা সাব, ভয় দেখানোর দরকারটা কী? সত্যি কথায় যদি ডরান হেডা অবশ্য আলাদা কথা। তারপর হঠাৎই গলার সুর নরম করে বাড়ির দিকে ফিরে বললো—তা আমাগো বইনডা কই, দেখি না যে, আপনাগো ছোট বোন মহুয়া বিবির কথা কইতাছি।

রউফ ভিতরে ভিতরে আঁতকে উঠলো। হেন অপকর্ম নেই যা সৈয়দ আলী কমান্ডার করছে না। এলাকার মানুষ তার ভয়ে অস্থির। কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ করলো

না রউফ। শান্ত ভঙ্গিতে প্রসংগ পাল্টালো। বললো—বাবাজানের সাথে কথা বলে নেই। তোমার টাকা লাগবে কবে?

বাড়ির দিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে এবার ছোট মোল্লার ওপর চোখ স্থির করলো সৈয়দ। বললো—জোগাড় করেন, এক সময় আইস্যা পরমু। তারপর আয়েশ করে রাইফেলটা বাম হাতে নিলো। ডান হাতে বাচ্চা শিশুকে আদর করার মতো করে হাত বুলালো ওটার ওপর, মুখে তার মুচকি হাসি। হাসিটায় কি সামান্য বিদ্রুপ মাখানো! কিছু না বলেই হঠাৎই লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটা শুরু করলো কমান্ডার। ডান হাতে রাইফেলটাকে একটা খেলনার মতো ধরে আছে। ওর চলে যাবার মধ্যে বিপদের গন্ধ পেলো রউফ।

এখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। কেমন যেন অস্থির লাগছে। সোলায়মানের মা'র অসুখ। তাই ওকে বাড়িতে পাঠাতে হয়েছে। বেশি দূরে নয়, কাছেই। তবুও বাড়িটা ফাকা হয়ে গেলো। বড় মোল্লার সাথে রাজাকার কমান্ডারের ব্যাপারে আলাপ করেছে রউফ। বড় মোল্লা খানিকটা চুপ করে থেকে বললো—বাবা, আমি চোখে দেখি না, তাই মনে হয় আল্লাহ অন্তর বড় করছে। আমাদের উপর বিপদ আইব। রাজাকারের জন্য হাজার পাঁচেক টাকা জোগাড় কর। আর মহুয়াকে বউমার সাথে তার খালার বাড়ি পাঠাও। মনে হয় আমাদের বাড়ি আর নিরাপদ না।

দেরি করেনি রউফ। ওদের পাঠিয়ে দিয়েছে আজ দু'দিন হলো। বাড়ি ফেরার জন্য আল থেকে উঠে দাঁড়ালো সে। সূর্য পাটে বসেছে অনেকক্ষণ। আকাশে মেঘের আনাগোনা। মনে মনে ভাবলো—এখন বাড়ি যাই, একদিন কাজ তদারকি কম করলেও অসুবিধা নেই।

কামলারা বিদায় নিয়েছে বেশ খানিকটা আগে।

ফেরার পথে রউফ শুনলো মসজিদে আজান হচ্ছে। মুসল্লিদের সাথে একত্রে নামাজ আদায় করলো সে। এলাকায় জোয়ান ছেলেপুলে তেমন কেউ আর নেই। সবাই চলে গেছে যুদ্ধে। না, পাকিস্তানি ও রাজাকারদের আর বরদাশত করা যায় না। মনে মনে ভাবলো রউফ। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। প্রতিজ্ঞা করলো ছোট মোল্লা, স্বাধীনতা পর্যন্ত যুদ্ধ। বাবাকে ফেলে না যেতে পারলে এখানেই গড়ে তুলবে মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ শিবির। নিজের যা আছে, দরকারে সব বিলিয়ে দেবে এ যুদ্ধে। ঘরে ফিরে এলো রউফ। বৃদ্ধা কাজের বুয়া ময়না বেগম বসে বসে ঝিমুচ্ছে। বড় মোল্লা খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছে।

বাড়ছে রাত। রউফ তার মাথার কাছে বসা। বড় মোল্লা বললো—যাও, আল্লাহর নাম নিয়া ঘুমাইয়া পড়। তবে কান খাড়া রাখবা। কোন শব্দ পাইলে পিছনের দরজা দিয়া পালাবা, সোজা তোমার খালার বাড়ি। ডাইনে বায়ে চাইবা না। আর ট্যাহাডা আমার মাথার নিচে বালিশের তলে রাহ।

রাত তিনটার দিকে বাড়ির ভেতর একটা কুকুর হঠাৎ ঘেউ ঘেউ করে উঠলো। ময়না বেগম উঠে হারিকেনের আলোটা সামান্য উসকে দিলো। কুকুরটা তারস্বর চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। এর সাথে সাথে বেশ কয়েকটা ভারি পায়ের শব্দ শোনা গেলো বাইরে।

ময়না বেগম রউফকে ঠেলা দিলো। বললো—আমার জানি কেমন কেমন লাগছে। তুমি ওড, উইড্ডা দেহ কুত্তাডা চিল্লায় ক্যান।

হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে দিক হারিয়ে ফেললো রউফ। কোন দিকে যাবে ঠিক বুঝতে পারলো না, হঠাৎ শুনতে পেলো সামনের দরজায় খটাখট খটাখট শব্দ।

কেডা রে? ময়না বেগম ভীত গলায় প্রশ্ন করলো।

আমরা আইছি, দরজা খোল। বাইরে থেকে কেউ কঠিন কণ্ঠে বললো।

এতো রাইতে আপনারা কারা, কওন যাইব না? মুহে কি কুরি অইছে? ময়না বেগমের গলা কঠিন হলো।

এবার স্পষ্ট ধমক এলো বাইরে থেকে। বললো—এই মাগী, বেশি কথা কইসনা। সাথে মিলিটারি আছে। দরজা খুইল্যা হেগো বইতে দে। তা না অইলে এক একটার পাছায় লাথি পরবো।

বড় মোল্লা এতক্ষণে পূর্ণ সজাগ। একটু কাশলো। গতো ক'মাস তাকে এই কাশিটা পেয়ে বসেছে। বললো—ময়না বেগম, দরজাটা খোলো, গোলমাল কইর না?

রউফ পিছনের দরজা খুলে ফেললো দ্রুত। ঘর থেকে পালাবার প্রবল ইচ্ছাটা তাকে তাড়া করছে। একটা কপাট ফাঁক করে যেই বাইরে পা দিলো অমনি মুখোমুখি সৈয়দ কমান্ডারের। একগাল হেসে বললো—কি মোল্লা সাব, পেচ্ছাব ধরছে নাকি?

রউফ কোন জবাব দিলো না। দরজার ফাঁকটা সামান্য বড় করলো যাতে ওরা ঢুকতে পারে। সৈয়দ কমান্ডারের সাথে আরো দু'জন। বললো—তোমার টাকা বাবার বালিশর নিচে রাখা আছে।

সৈয়দ কমান্ডার বিজ্ঞের ভঙ্গিতে হাসলো। বললো—ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি জানতাম আপনার বুদ্ধি আছে। তয় এতো রাইতে যহন আইলাম একটু চা পানি খাওয়ান, থানা দিয়া আবার বড় সাহেবও আইছে। ঐ যে পাকিস্তানি হাবিলদার সাব। কইলো, চল সৈয়দ, তোর সাথে যাইয়া একটু দেশটা দেইক্যা আই।

রউফ কোন কথা বললো না। ঘরের মধ্যভাগ দিয়ে ওদের নিয়ে সামনের বারান্দায় ওর বাবার কাছে চলে এলো। সেখানে চেয়ারে বসা ভুঁড়ি অলা এক লম্বা চওড়া লোক। মাথায় সামান্য টাক। দাড়ি পরিপাটি করে কামান, তবে বেশ লম্বা জুলফি। মুখে গোটা বসন্তের দাগ। এরই নাম সম্ভবত জানজুয়া। নাম শুনেছে রউফ, তবে দেখেনি কখনো।

ইয়ে কৌন হ্যায়? রউফকে দেখিয়ে জানজুয়া প্রশ্ন করলো।

হুজুর, বড় পোলা। আমরা কই ছোট মোল্লা। খুব ভাল। যা কইবেন হুনবে। সৈয়দ কমান্ডার বিনয়ে বিগলিত হয়ে জবাব দিলো।

জেয়াদা বকো মাত, কোন হ্যায় ইয়ে। গম্ভীর কণ্ঠ জানজুয়ার।

মোল্লাকা লাড়কা হুজুর। ভড়কে বললো সৈয়দ কমান্ডার।

চা বসাও বুয়া। রউফ ময়নাকে ডাক দিয়ে বললো।

বসাইতাছি, আর কী দিমু? বিস্কুট দেলে অইবে। ভিতর থেকে জবাব দিলো ময়না বেগম।

যা আছে তাই দাও। রউফের কণ্ঠ শুকিয়ে কাঠ কাঠ।

কাজের ম্যাইয়া চা বানাইলে ভাল অইব না, ভাবিরে নয় তো মহুয়ারে কন চা বানাইতে। বড় সাইবে খাইবো, আমাগো জন্য না। সৈয়দ রউফের দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বললো কথাগুলো।

সৈয়দ, তোমার টাকা আমার বালিশের নিচে, লইয়া যাও। বড় মোল্লা খুক খুক করে কাশতে কাশতে বললো।

মহুয়া, বহুত আচ্ছা নাম হায়। উসকো বোলাও, কুচ বাতচিত হো যায়। হাম রুপেয়া নেহি মাঙতা। রুপেয়া হামকো পাছ ভি হায়। জানজুয়া গম্ভীর।

কোন জবাব দিলো না রউফ। মনে মনে শুধু বললো—হে আল্লাহ, এ জালিমদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা কর।

সৈয়দ আলী হে হে করে হাসলো কিছুক্ষণ। বললো—বুঝলেন মোল্লা সাব, বড় সাইবে বুইনডার সাথে একটু কথাবার্তা কইতে চায়। মোসলমান ভাই, দোষের কী? দোয়া দিয়া যাইব গিয়া।

ওরা বাড়িতে নেই, বেড়াতে গেছে। রউফ অন্য দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো।

সৈয়দ কমান্ডার আবার কিছুক্ষণ হাসলো হে হে করে। বললো—তাই নকি মোল্লা সাব। হে হে হে..... । তা আমাদের সবাইগো খোঁজাখুঁজিতে লাগাইলে ভাবিও ঝামেলায় পড়ব। ঘুমে থাকলে উডাইয়া আনেন গিয়া।

এরই মধ্যে ময়না ধূমায়িত চায়ের কাপ ও বিস্কুটসহ ঢুকলো। তার বয়সের ভারে নুয়ে যাওয়া শরীরে একটা অজানা ভয় ভয় করছে।

হাবিলদার জানজুয়া চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো, আবার বসে পড়লো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে। তারপর প্রচণ্ড জোরে হুংকার ছাড়লো—সৈয়দ।

ময়না বেগম জীবনে এতো জোরে কখনো এরকম কণ্ঠ শুনেনি। জীবনে বহু ঝগড়া বিবাদ দেখেছে—কোপাকুপি, রক্তারক্তি পর্যন্ত। কিন্তু আজকের আওয়াজে ভয় পেয়ে ওর হাত থেকে চায়ের কাপ পড়ে গেলো। দু'তিনটা কাপ আর পানির গ্লাস ভেঙে চুরমার। পানি গড়িয়ে মেঝে ভিজে একাকার।

উত্তেজিত ভাবে কমান্ডারের দিকে ফিরে চোখ পাকালো জানজুয়া।

কমান্ডারের মুখের হাসি নিবে গেলো। থতমতো খেয়ে বললো—হুজুর, ইয়ে ইয়ে..... ।

জানজুয়ার চোখ লাল। চিৎকার করে বললো—হারামজাদা, তোমহারা মহুয়া এতনা বুড্ডা! ইয়ে, ইয়ে লে আয়া কর হারামখোর কাহিকে।

সৈয়দ কমান্ডার কাঁপতে কাঁপতে বললো—হুজুর রানি, ন....ক ন...ক রানি, রীতিমতো তোতলাচ্ছে সে। রউফের দিকে ফিরে বললো—মোল্লা সাব, তাড়াতাড়ি ডাকেন, সাবে রাগতে শুরু করছে কিন্তু।

রউফ বললো—ওরা বাড়িতে নেই, বেড়াতে গেছে। জানজুয়ার দিকে ফিরে বললো—ও লোক ইধার নেহি হ্যায়। বাহার গিয়া।

সৈয়দ লাফ দিয়ে মাঝখানে পড়লো। জানজুয়ার দিকে ফিরে বললো—হুজুর মিথ্যা, মিথ্যা কথা, ঝুটবাত।

জানজুয়া রাগলে টাকে চাপড় মারে। সৈয়দ কমান্ডারকে বললো—এ মোল্লা আদমিকে ইধার রোখ। তোমলোগ ঢুন লাড়কিকো, রাত খতম হো রাহা হায়। হাম ইধার জেয়াদা ইন্তেজার নেহি করেঙ্গে।

পরবর্তী আধাঘণ্টা সৈয়দ কমান্ডারের তিনজন লোক ঘরের মধ্যে ঝড় তুললো। ধানের মোড়া কেটে ফেললো। চালের মটকা ফাটিয়ে ছড়িয়ে দিলো চাল। ফেঁড়ে ফেললো সমস্ত তোশক। লেপ, চাদর টেনে ফেলে দিলো। চকির নিচে ঢুকে খোঁজাখুঁজি করলো। অবশেষে এসে সৈয়দ জানজুয়ার সামনে দাঁড়ালো কাঁপতে কাঁপতে। বললো— কোথাও নাই হুজুর, গায়েব, বিলকুল উধাও।

জানজুয়া উঠে দাঁড়ালো। মাথায় ডান হাত দিয়ে চাপড় মারছে। হঠাৎ করেই প্রচণ্ড জোরে সৈয়দের গালে এক থাপ্পড় মারলো। ছিটকে পড়লো সৈয়দ। আবার উঠে দাঁড়ালো। তার রাইফেল এখন মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। হাত থেকে কখন পড়ে গেছে খেয়াল নেই। তার দিকে ফিরে গর্জে উঠলো জানজুয়া।

হামকো ঝুট কাহা তোম?

থরথর করে কাঁপছে কমান্ডার সৈয়দ। বললো—না না, ঝুট বাত নেহি হুজুর। মনে অয় কোথাও গেছে—বাহার চলা গিয়া।

হুঙ্কার ছাড়লো জানজুয়া। বললো—এ মোল্লা সালেকো হামকো সাথ লে চলো। বড় মোল্লার দিকে ফিরে বললো। এ আন্ধা বুড্ডা, তেরে লাড়কাকো লিয়ে লাড়কিকো ভেজানা পরে গা।

ওরা সবাই মিলে রউফকে পিছমোড়া করে বাঁধলো। মসজিদে ফজরের আজান শুরু হয়েছে। রউফকে কোলে পিঠে করে বড় করেছে ময়না। ওকে নিয়ে জানজুয়া আর

তার দলবল যাত্রা করতেই হাউমাউ শব্দে কেঁদে উঠলো ময়না বেগম। বড় মোল্লা উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলো—লা ইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ, আল্লাহ তুমি হেফাজত কর। বলতে বলতে জ্ঞান হারিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়লো বড় মোল্লা।

৩

দিনের আলো ফুটি ফুটি করছে। বড় মোল্লার জ্ঞানহীন দেহের পাশে বসে আহাজারি করছে ময়না। ও ভাইজান, তোমার কি অইলো গো। আহারে অহন কি অইবে গো। প্রতিবেশীরা ভিড় করলো অনেকেই। মিলিটারি এসেছিলো শুনে মুখ পাংশু করে সরে পড়লো কেউ কেউ। কে-ই বা ঝুট ঝামেলায় যেতে চায়। হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে সোলায়মান এসে ঢুকলো ঘরে। ঢুকেই দৌড়ে বড় মোল্লার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ময়নাকে জিজ্ঞেস করলো—কি অইছে?

কি আর অইব গো, তোর ছোট চাচারে নিয়া গেছে গো, আহারে মিলিটারি আইছিলো গো। আহাজারি করতে থাকে ময়না বেগম।

কখন গেছে তেনারা? সোলায়মানের কণ্ঠে কাঠিন্য ফুটে উঠেছে।

ময়না বেগম বুকে চাপড় মারতে মারতে বললো—মিনিট পনর অইব মনে হয়। থানা সদরে যাইব কইছে গো। ময়না বেগম ঝুকে বসে বড় মোল্লার মুখের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো—ভাইজান গো, ও ভাইজান গো, কি অইলো গো..... ।

সোলায়মান ত্বরিৎ গতি বারান্দায় ঝুলান তার বলদ জোড়ার জোয়াল তুলে নিলো হাতে। লাফ দিয়ে বাইরে নামতে নামতে বললো—তুই বড় চাচার মাথায় পানি ঢাল, আমি আইলাম। দ্রুত ছুটছে সোলায়মান। মনে মনে ভাবলো গাছ কাটা দাওটা আনলে ভাল করতাম। ছুটতে ছুটতে হিসাব কষছে কোন দিক থেকে গেলে সোজা সদরের বড় রাস্তায় ওঠা যাবে। আবার ভাবলো, আমি তো গাধা। বুদ্ধির ঠিক নাই। তারপর মনে মনে আল্লাহকে ডাকলো। বললো—আল্লাহ, তুই আমারে গাধা বানাইছ। আইজ কামে যেন ভুল না হয়।

ছুটলো বাগানের মাঝখান দিয়ে সোজা মাঠের দিকে। একটা গাছের শিকড়ে পা বেধে হোছট খেতে খেতে সামলে নিলো নিজেকে। তাকিয়ে দেখলো বড় রাস্তা। বড় একটা বাঁক নিয়ে এগিয়ে গেছে রাস্তা সদরের দিকে। ভাবলো, যদি মাঠের মধ্যে দিয়া দ্রুত যাইতে পারি তা অইলে দলটার মুখোমুখি হওয়া সম্ভব।

বিসমিল্লাহ বলে ধান ক্ষেতের মধ্য দিয়ে ছুটলো সোলায়মান। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ও ছুটলো একরোখা গতিতে। যখন মাঠ পার হয়ে রাস্তায় উঠলো সূর্য তখন উজ্জ্বল আলো বিলাতে শুরু করেছে পৃথিবীর বুকে। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। ঐ তো খানিকটা দূরে

ছোট চাচারে গরুর মতো বাইন্দা নিয়া যাইতাছে। সাথে কয়জন, উঁচা ডাঙ্গর মোটা মাথাডার দুই দিকে আরো চাইড্ডা মাথা। নিশ্চয়ই কমান্ডারের বাচ্চা আছে সাথে, ভাবলো সোলায়মান। তাড়াতাড়ি রাস্তার পাশের তাল গাছের আড়ালে দাঁড়ালো সে। হ, এহন সব দেহা যায়। মোট পাঁচজন, ঐ মোটা ধারিটা সহ। নিজের শরীরের দিকে তাকালো সোলায়মান। তারপর জোয়ালটা শক্ত করে ধরে মনে মনে বললো—আল্লাহ ভরসা। ন্যায়-অন্যায়ের ফয়সালা অহনই অইব।

দলটা কাছে চলে এসেছে। ঘাপটি মেরে আছে সোলায়মান। পাকিস্তানি মাথা মোটার আওয়াজ শোনা গেলো, এই মোল্লা, তেরা বহিন নেহি মেলা তো হাম তোমকো গোলি মার দেঙ্গে।

ছোট মোল্লার মুখের মাংসপেশী শক্ত হলো। বললো—এ অন্যায় আল্লাহ সইবে না। জানজুয়া কমান্ডারের দিকে ফিরলো। বললো—এ আদমি কেয়া কাঁহা?

কমান্ডার বিস্ময়ে বিগলিত হয়ে বললো— এ আদমি হুজুর, পাপকা কথা বলছে।

জানজুয়া মাথায় চাপড় মারলো। বললো—তোম আভিতক উর্দু বাত তমিজছে নেহি শিখা। তারপর রউফ মোল্লার দিকে ফিরে বুকে টোকা দিয়ে বললো—হাম মুসলিম হ্যায়। তোমতো আচ্ছা ইনসান ভি নেহি হো, মুসলিম ভি নেহি হো। হাসিনা আওরাতকা জরুরাত হায় জংমে। সমঝা কুচ? বিরাট প্রশ্ন মেলে রউফের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলো জানজুয়া। তারপর কমান্ডারের দিকে তাকিয়ে বললো—ছমঝাও এ আদমিকে।

হঠাৎ গাছের আড়াল থেকে দু'হাত পথ আগলে দাঁড়াল সোলায়মান। চমকে উঠলো রাজাকার কমান্ডার । ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার মুখ।

এ আদমি কোন হায়? উচকো হটাও। নেহিতো হাম শালেকো গোলিছে মারডালেগা। হুঙ্কার ছাড়লো জানজুয়া।

হুজুর, আদমি লোক শক্তিশালী। মোল্লাকা চাকর। রাজাকার কমান্ডার কাঁপতে কাঁপতে বললো।

সোলায়মানের মুখ লাল। চোখ বড় বড়। বললো—আমি চাকর অই আর নকর অই, তোরা ছোট চাচারে ছাড়। নইলে মরবি।

জানজুয়া হুঙ্কার ছাড়লো--কেয়া বোলা, হামকো রোখে গা তু। কমান্ডার, শালেকা গোলি মার।

বাজখাই আওয়াজ তুলে নিজের বেল্টে পিস্তলের দিকে হাত বাড়ালো জানজুয়া। সেই হাত বাড়ানই হলো তার কাল। সোলায়মানের ডান হাতে বিদ্যুৎ খেলে গেলো। নিমিষে জোয়ালটা দিয়ে মারলো জানজুয়ার ডান কাঁধে। তারপর বাম কাঁধে। মড় মড় করে হাড় ভাঙ্গার শব্দ হলো। দু'জন রাজাকার রাইফেল ফেলে ধান ক্ষেতে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকলো। রাজাকার কমান্ডার শেষ চেষ্টা করলো। ডান কাঁধ হতে রাইফেল নামাবার চেষ্টা করতেই সোলায়মান ওর গলা চেপে ধরল। তারপর রাইফেলটা বাম হাতে নিয়ে ওর বাঁট দিয়ে মারলো কমান্ডারের মাথায়। মাটির হাঁড়ি ভাঙ্গার মতো একটা মড় মড় শব্দ হলো। তাকে দু'হাতে ধরে ছুড়ে মারলো তাল গাছের দিকে। সরাসরি তাল গাছের সাথে বাড়ি খেয়ে নেতিয়ে পড়লো কমান্ডার।

আবার ফিরলো জানজুয়ার দিকে। জানজুয়া তখন ঝুলন্ত অকেজো দু'হাত নিয়ে সড়ক দিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে চিৎকার করছে-শালে কো গোলি মার। মুহূর্তে তাকে ধরে ফেললো সোলায়মান। পা ধরে আছাড় মেরে রাস্তার ওপর ফেললো মুহূর্তে। বললো—হালার পো, তুইতো মুসলমান। শেষ বারের মতো আল্লাহর নাম নে।

জানজুয়ার চোখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো। সোলায়মানের মুখ লাল, নাকের ফুটো দু'টো আরো বড় হয়ে উঠেছে। জানুজুয়ার চোখের দিক একরোখা ভঙ্গিতে তাকিয়ে। সাঁই করে সুন্দরী কাঠের জোয়ালের ধারালো দিকটা আমুল বিঁধিয়ে দিলো তার বুকে। একটা অশরীর চিৎকারে ভোরের বাতাস কেঁপে উঠলো।

হঠাৎ করে পটাস করে একটা গুলির আওয়াজ। প্রচণ্ড আঘাতে কেঁপে উঠলো সোলায়মান। ঘুরে দেখলো এক রাজাকার, যে লুকিয়েছিলো, হঠাৎ সুযোগ পেয়ে গুলি করে বসেছে। ডান দিকের বুক এফোঁড় ওফোঁড় হলো সোলায়মানের। তার শক্তির উৎস সে জানে না তবে ফিরেই প্রিয় জোয়ালের ফলাটা এক হ্যাচকা টানে জানজুয়ার বুক থেকে তুলে ছুঁড়ে মারলো ঘাতকের দিকে ওটা বিঁধলো সোজাসুজি বুকে। হতভম্ব রাজাকার আর দ্বিতীয় গুলি করার সময় পেলো না। বিরাট জোয়াল বুকে নিয়ে হুড়মুড় করে পড়লো ধানক্ষেতের মধ্যে, ধীরে ধীরে পানিতে খাবি খাচ্ছে ওর শরীর।

ছোট মোল্লা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দ্রুত ওর বাঁধন খুললো সোলায়মান। ছোট মোল্লা ওকে জড়িয়ে ধরে থরথর করে কাঁপছে আবেগে। চোখ দিয়ে ঝরঝর করে গড়াচ্ছে অশ্রু। বললো—তাড়াতাড়ি চল। তোকে ডাক্তারের কাছে নিতে হবে।

সোলায়মানের মুখে এক চিলতে হাসি। বললো—ছোট চাচা, আগে ঘরে চলেন। বড় চাচারে অজ্ঞান দেখছি।

রউফ সোলায়মানের বুকে নিজের শার্ট দিয়ে পোটলা বেঁধে চেপে ধরে আছে যাতে রক্তক্ষরণ না হয়। যখন ওরা বাড়িতে পৌঁছল তখন চারদিকে লোকের ভিড়। মুন্সি বাড়ির তোফাজ্জেল মুন্সি বললো—মিলিটারি মারছ, এখন তো ওরা আমাগো জ্বালাইয়া পোড়াইয়া খাক কইরা দিব।

আপনারা মাইয়া লোকের কাপড় পইরা লজ্জা ঢাহেন আর বিদেশিরা আমাদের সাথে অনাচার করুক। সোলায়মান হাঁপাতে হাঁপাতে বললো।

মুন্সি সাব লজ্জা পেয়ে চুপ করলো। ঘরের বারান্দায় যখন সোলায়মান পৌঁছল তখন ওর চলার শক্তি প্রায় নিঃশেষ। বড় মোল্লা হুঁশ ফিরে পেয়েছে। ওদের দেখে

ময়না বেগম চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। বললো—ভাইজান, সলু ছোট মিয়ারে নিয়া আইছে।

জলদি একজন ডাক্তার ডাক, তা না হলে ওরে বাঁচান যাবে না। রউফ পাশের বাড়ির ফয়েজকে উদ্দেশ্য করে বললো।

বড় মোল্লা বিছানা থেকে নামার চেষ্টা করছে। বললো—রউফ, তুই আইছ।

সলু গাধাটা জীবন বাজি রেখে লড়াই করেছে বাবা। ওদের তিন জনকে মেরেছে আর দু'জন কোন রকমে পালিয়ে গেছে। আবেগে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো রউফ।

বড় মোল্লা কাঁপতে কাঁপতে বিছানা থেকে নামলো। বললো—ওরে, সলুর হাতটা একটু আমার হাতে দে।

বড় মোল্লা সোলায়মানের হাত ধরে বসে আছে। ফয়েজ সংবাদ আনলো, দুঃসংবাদ। ডাক্তার পাওয়া যায় নি তবে মিলিটারি আসছে।

সোলায়মানের শক্তি শেষ। এখনও রক্ত পড়েছে। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে ওর মুখ, সমস্ত শরীর। কোন রকম দম ধরে বললো— ছোট চাচা, লড়াই করবা, কথা দাও। আমার মরণরে মিথ্যা অইতে দিও না। বলতে বলতে নিস্তেজ হয়ে ঢলে পড়লো সোলায়মানের মাথা।

ও রউফ, সলু হঠাৎ কথা থামাইলো ক্যান? বড় মোল্লা ভয় পাওয়া গলায় বললো।

বাজান, ও আর নাই। রউফের গলা কান্নায় ভারি হয়ে উঠেছে।

বড় মোল্লা বিমূঢ়। বসে রইলো কিছুক্ষণের জন্য, তারপর উঠে দাঁড়ালো। আবেগে তার কণ্ঠ কাঁপছে। বললো—মুক্তি বাহিনীগো সংবাদ দাও। মিলিটারি আইলে আমাগো জায়গা আমার ছাড়মু না, লড়াই করমু বীরের মতো, এই সলু গাধাটার মতো। বলে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললো বড় মোল্লা।

উপস্থিত তরুণদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো। রেহান বললো—সলু পারছে, আমারও পারমু। চলো সবাই তৈয়ার হই। আমাগো যা আছে, ঐ দিয়াই চলবে। চলবে না?

রউফ উঠে দাঁড়ালো। বললো—অবশ্যই চলবে। আমাদের দেশ, আমাদের মাটি, যতক্ষণ জান আছে ততক্ষণ যুদ্ধ।

রউফ ভাই যতক্ষণ জান, ততক্ষণ যুদ্ধ চিৎকার করে বলে উঠল উপস্থিত অনেকেই।

রউফ গর্বিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে দেখল, সম্মিলিত নির্ভীক দু'টো হাত প্রতিজ্ঞায় উঁচু হয়ে আছে ওরা সবাই।

ব্রাভো বাংলাদেশ

ড্রয়িং রুম এখন রীতিমতো সরগরম।

মামা এবার উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

মামানি বেশ শান্ত স্বভাবের। বললেন—তোমরা এভাবে হইচই করলে খেলা দেখব কী করে?

দেখবে চোখ দিয়ে, শুনবে কান দিয়ে, মামা নির্বিকার ভাবে বললেন। বলেই আবার বসে পড়লেন। যেন জুত পাচ্ছেন না কোন ভাবে। মামা এবার পা নাড়াতে শুরু করলেন জোরে জোরে। এটা তিনি করেন বেশি আবেগ প্রবণ কিংবা উত্তেজিত হলে।

পা নাড়াতে নাড়াতেই বললেন—খেলা শুধু দেখতে হয় না, খেলায় খেলোয়াড়দের মতোই অংশ নিতে হয়।

মামানি বললেন—পা নাড়ান বন্ধ কর। এবার তোমার ষ্ট্রাকচার হবে। গত ওয়ার্ল্ড কাপে তো অল্পের উপর পার হয়েছিলে, ভাগ্যিস তখন বাংলাদেশ ছিলো না।

মামার পা নাড়ানোর গতি কমলো না। তিনি প্রমাণ করেছেন মানুষ অভ্যাসের দাস। আমি বলি শুধু দাস নয়, দাসানুদাস। তা না হলে মামার এ অবস্থা হয়? মামা তাঁর অভ্যাসের গোলামি অব্যাহত রেখেই বললেন—বাংলাদেশ থাকলে কী হতো?

মামানি খানিকটা বিরক্ত হলেন। বললেন—খবরের কাগজে সংবাদ শিরোনাম হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকতো। এবারে কী কর, আমি তো ভয়তে ভয়তেই আছি?

হতে পারলে তো খুশিই হতাম, কিন্তু হব কী ভাবে? মামা টেলিভিশন থেকে চোখ না সরিয়ে বললেন।

মামানি গম্ভীর। মামা বললেন—না, বাবা না। বাচ্চা নিয়ে সবুজ এই বাংলাদেশের মাটিতে আরো কিছুদিন হেসে খেলে বাঁচতে চাই।

মামানি মামার দিকে তাকিয়ে আছেন। বললেন—তাহলে ঝাঁপাঝাঁপি বাদ দাও, বয়সের দিকে খেয়াল রেখে শান্ত হয়ে খেলা দেখ।

মামা এতোক্ষণে কিছুটা শান্ত হয়ে সোফায় বসলেন। হাসান ব্যাটিং করছে। কোন রকমে ঠেলে উইকেট রক্ষা করেছে সে। সবুজ জার্সিতে তার ঘর্মাক্ত মুখে সংকল্পের ছাপ।

মামা হাঁকলেন—হাসান পিটা, আরে বাবা বুকে সাহস রাখ। সাদা চামড়া দেখে ঘাবড়ে যাসনে।

ভাবি এতোক্ষণে পিয়াজ আর কুচি কুচি করে কাটা কাঁচা মরিচের সাথে গরম গরম তেলেভাজা মচমচে মুড়ি এনে টেবিলের উপর রাখলেন।